স্বপ্ন-রঙিন দিন

আহমাদ সাব্বির

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

এক

মোরগের কুক কুরু ডাকে ঘুম ভাঙে মাহমুদের।

গায়ের ওপর থেকে কম্বলটা যেই সরাল, অমনি বরফের মতোন হিম এসে জাপটে ধরে তাকে। হঠাৎ করে এমন ঠান্ডা বাতাস কোন দিক দিয়ে ঘরে ঢুকল! মাহমুদ বাতাসের প্রবেশ-পথ খোঁজার জন্য কম্বলের মধ্যে থেকেই চারপাশে চোখ বুলিয়ে নেয় একবার। জানালার কপাট দুটো হা হয়ে আছে। ভালো করে ভাবতেই মাহমুদের খেয়াল হয়, গতদিন বিকালে ছিটকানিটা ভেঙে গেছে। মনে করে সেটা আর ঠিক করা হয়নি। বাতাসটা অমন নির্দয়ভাবে ঘরে ঢুকে হামলে পড়তে পেরেছে তাই মাহমুদের ওপর।

আবারও শোনা যায় মোরগের ডাক। এবারে আর ওঠতে চায় না মাহমুদ কম্বল ছেড়ে। উষ্ণতায় দুই চোখ তার বুজে আসতে চায়। আলস্য একদম ভালো রকম ঘিরে ধরে মাহমুদকে। কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্যই। মুহূর্তের জন্যই অলসতা জড়িয়ে রাখতে পারে তাকে। কম্বল সরিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় মাহমুদ। তার খেয়াল হয় যে, আর কিছু সময় গরম কম্বলের নিচে এভাবে পড়ে থাকলে ফজরের জামাআতটা ধরতে পারবে না। ভাইয়ার কাছে সে যে কথা দিয়েছে, আর কখনও সালাত ছাড়বে না। এবং প্রতি ওয়াক্ত সালাত সে জামাআতের সাথেই আদায় করবে। আরামদায়ক বিছানা ছেড়ে এখনই না উঠলে সে কথা তবে আর রাখা হবে না।

মাহমুদ উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। বৃষ্টির মতোন ঘন হয়ে কুয়াশা নামছে। এবারের শীতটাও অন্যবারের চাইতে বেশি মনে হচ্ছে। বাথরুমের ট্যাপের পানি এই সময়টাতে হয়ে থাকে বরফের মতোন ঠান্ডা। মনে হতে থাকে যেন বরফ গলিয়ে কেউ ঢেলে দিয়েছে পানির ট্যাঙ্কির মধ্যে। ফজরের এই সময়টাতে ওযু করতে গেলে কিংবা হাত-মুখ ধুতে গেলে শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মনে হতে থাকে, বোধ হয় ধারালো ছুরি দিয়ে কেউ কেটে নিচ্ছে হাত-পা-আঙুল।

মাহমুদ কলপাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। ভোররাতে ওযু করবার জন্য কলের পানিই ভালো। কিছু সময় চাপার পর গরম পানি বের হতে থাকে। সেই পানিতে ওযু করলে শরীরে একটা উষ্ণ ভাব তৈরি হয়। আরামও লাগে খানিকটা। মাহমুদ তাই ট্যাপের পানি রেখে চাপকলের পানিতেই ওযু সারে প্রতি ভোরে। যদিও কল চাপতে কষ্ট হয় তার। বেশ ভালোই কষ্ট হয়। কল চাপা বেশ শক্ত কাজ। ওর মতো বাচ্চা ছেলের জন্য একা একা কল চেপে ওযু করা বেশ পরিশ্রমের। তবু মাহমুদ এটা করে। এতটুকু পরিশ্রম করতে সে রাজি হয় আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা থেকে।

হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা। এই মন্ত্রই মাহমুদকে এমন সাত সকালে জাগিয়ে তোলে। এমন শীতের দিনেও গরম কম্বলের ভেতর থেকে বের করে আনে কলপাড়ে। তারপর কল চেপে ওযু শেষে তাকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় ফজরের সালাতের কাতারে। এর সবই মাহমুদ করে আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা থেকে।

মাহমুদের ভাইয়া তাকে বলেছে যে, আল্লাহ তাআলাকে যে ভালোবাসে তার কাছে আল্লাহ তাআলার কোনো আদেশ মানা কঠিন নয়। কঠিন তো তার কাছেই, যে তাঁকে ভালোবাসে না।

আগে মাহমুদ রোজ ঘুমিয়ে থাকত। ওর ঘুম ভাঙত ফজরের সালাতের অনেক পর। সকাল সাতটায় স্কুলে যাবার জন্য মা যখন ওকে ডেকে তুলত ঘুম থেকে, তখন। সেই বেলা পর্যন্ত কম্বল প্যাঁচিয়ে শুয়ে থাকত মাহমুদ। কারোর সাধ্য ছিল না তাকে ডেকে তোলে বিছানা থেকে। আব্বু ডেকে যেতেন একবার। আম্মু এসে খানিক বকাবকি করে ফিরে যেতেন। উঁহু, মাহমুদ যেন শুনতেই পেত না কারোর আহ্বান। গায়েই লাগত না তার কারোর বকাবকি।

এরপর ভাইয়া একদিন দেখলেন যে, মাহমুদ বড় হচ্ছে। এখনই যদি সালাতে অভ্যস্ত হতে শুরু না করে, পরে আরও কঠিন হয়ে যাবে। মাহমুদকে ডেকে একদিন বোঝালেন ভাইয়া। মাহমুদ বাধ্য ছেলের মতোন চুপচাপ শুনে গেল ভাইয়ার কথা। আর কারোর সামনে স্থির না হতে পারলেও ভাইয়ার সামনে মাহমুদ একান্ত অনুগত। একদমই সভ্য, শান্ত। মন দিয়ে শুনে যেতে থাকে মাহমুদ ভাইয়ার কথা। তা ছাড়া, ভাইয়ার কথা বলার ভঙ্গিই এমন যে, চোখ সরানোই যায় না তার চেহারা থেকে। এমন সুন্দর করে কথা বলেন না তিনি!

ভাইয়া বলেন,

: মাহমুদ! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বানিয়েছেন। দেখ, তিনি তোমার চোখ দুটো কত সুন্দর করেছেন! তোমার গাল কত মসৃণ করেছেন! কেমন সুন্দর পরিপাটি করে সাজিয়েছেন তোমার সমস্ত দেহ! এরপর তিনি তোমার জন্য ব্যবস্থা করেছেন হরেক রকম খাবার-দাবার ও ফল-ফলাদির। তুমি অসুস্থ হলে তিনি তোমাকে সুস্থ করে দেন। তোমার পিপাসা পেলে তিনি তোমার পিপাসা দূর করে দেন। এমন যিনি, যিনি আমাদের জীবন দিয়েছেন, বেঁচে থাকার উপাদান-উপকরণ দিয়ে চলেছেন, আমাদের কি তাঁকে ভালোবাসা উচিত নয়?

মাহমুদ মুগ্ধ হয়ে শুনছে ভাইয়ার কথা। পলকও পড়ছে না যেন। কিন্তু তার বুঝে আসে না যে, ভাইয়া তাকে এমন প্রশ্ন কেন করল! সে তো আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসেই! এবং মন থেকেই ভালোবাসে। দৃঢ় চিত্তে সে ভাইয়ার জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়,

: আমি তো আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসিই। তাঁকে আমি অনেক ভালোবাসি, ভাইয়া!

উত্তরটা ঠিকঠাক মতোন দিতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মাহমুদ। ভাইয়ার সামনে কথা বলতে গেলে সব গুলিয়ে যায় তার। তালগোল পাকিয়ে মনের কথাটাই শেষমেষ বলে উঠতে পারে না। ভালো লাগছে যে, আজকের উত্তরটা সে ঠিক মতোন দিতে পেরেছে।

ভাইয়া মুচকি হাসেন। ভাইয়ার সেই হাসি দেখে মাহমুদ কিছুটা ঘাবড়ে যায়। তাহলে কি ভুলভাল কিছু বলে ফেলল সে! কিছুটা চিন্তায় পড়ে যায় মাহমুদ। ভাইয়া আবার মুখ খোলেন,

: আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসো! ভালো কথা। কিন্তু সে ভালোবাসার পরিমাণ কত! আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা ফজরের সময় তোমাকে ঘুম থেকে জাগাতে পারে না। তাঁকে তুমি এতই ভালোবাসো যে তাঁর আদেশ পালনের জন্য সামান্য ঘুম তুমি ছাড়তে পারো না। কম্বলের ভেতর থেকে বেরিয়ে মাসজিদ পর্যন্ত যেতে তোমার ভারি কষ্ট হয়! কিন্তু শুক্রবারে যেদিন খেলা থাকে, ঠিকই সেদিন সাত সকালে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে মাঠে চলে যেতে পারো। বিন্দুমাত্র কষ্ট কিংবা

বিরক্তি হয় না তোমার।

ভাইয়া বলে চলেন। তার কথাগুলো একটু ভারী মনে হয়; তবে তিনি উত্তেজিত নন। বরং তার স্বরে কোমলতা অনুভব করা যায়। যে কোমলতা আলতো করে স্পর্শ করে যায় মাহমুদের হৃদয়। সে অনুতপ্ত হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে ভাইয়ার সামনে।

ভাইয়া বলে চলেন,

: আল্লাহ তাআলাকে তুমি কতোটা ভালোবাসো তা প্রমাণ হবে তোমার কাজে। তাঁর আদেশ তুমি কতোটা আন্তরিকভাবে মানতে পারছ তা থেকেই বোঝা যাবে তাঁর প্রতি তোমার ভালোবাসার পরিমাণ। শীত-ঠান্ডা-ঘুম সব উপেক্ষা করে ফজরের সালাত যদি মাসজিদে গিয়ে পড়তে পারো তবেই বোঝা যাবে যে, তুমি ভালোবাসো আল্লাহ তাআলাকে। শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস যদি সব কিছু উপেক্ষা করে নিয়মমতো সালাত আদায় করে যেতে পারো, আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ মেনে চলতে পারো, তবেই না প্রমাণ হবে আল্লাহ তাআলার প্রতি তোমার ভালোবাসা! আর মাহমুদ, আল্লাহ তাআলাকে তোমার ভালোবাসতেই হবে। তাঁর বান্দা হিসাবে তাঁকে ভালো না বেসে আমাদের যে উপায় নেই!

কলপাড়ে দাঁড়িয়ে মাহমুদ ভাইয়ার বলা সেদিনের কথাগুলো মনে করতে থাকে। আর কেমন যেন আপ্লুত হয়ে পড়ে ভেতরে ভেতরে। আল্লাহ তাআলাকে তো সে সত্যিই ভালোবাসত। ভাইয়া যেদিন কথাগুলো বললেন তারও অনেক আগে থেকেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ যে এভাবে দিতে হয়, এবং এভাবেই তাঁর আদেশ পালনের মধ্য দিয়েই যে তাঁকে প্রকৃতভাবে ভালোবাসতে হয়—সেটা অমন করে জানত না মাহমুদ।

মাহমুদ ভাইয়ার বন্ধ ঘরটার দিকে একবার তাকায়। জমাট অন্ধকার ঘিরে রেখেছে পুরো ঘর। ভাইয়া যে কয়টা দিন বাড়িতে এসে থাকেন তখনই কেবল আলোয় ভরে থাকে তার ঘরটা। বাকি ক'দিন এমনই অন্ধকার হয়ে থাকে। হঠাৎই ভাইয়ার কথা মনে হওয়াতে কেমন ভিজে ওঠে মাহমুদের মন। এক মুহূর্তের জন্য মনে হতে থাকে যেন একরাশ নরম শীতল কুয়াশা কেউ ছড়িয়ে দিয়েছে তার মনের ভেতরটায়।

কল চাপার জন্য ঘুরতে যাবে অমনি মাহমুদ দেখে যে, পেছনে মা দাঁড়িয়ে আছেন।

তার হাতে প্লাস্টিকের একটা জগ। মা বললেন,

: আর কল চেপে কাজ নেই। গরম পানিটুকু দিয়ে ওযু করে নাও।

মাহমুদ কিছুটা অবাক হয়। বলে,

: তুমি আবার কষ্ট করতে গেলে কেন!

মা মুখে মিষ্টি হাসি টেনে বলেন,

: বা রে! আল্লাহ তাআলাকে ভালোবেসে তুমি আরামের ঘুম ছাড়তে পারলে আর আমি একটু কষ্ট করে পানি গরম করে দিতে পারব না! আল্লাহ তাআলাকে আমি বুঝি ভালোবাসি না!

কথা শেষ হয়ে যায়। তবু মায়ের সে মিষ্টি হাসির রেশটুকু রয়ে যায় আরও অনেক সময়। মাহমুদ অপলক তাকিয়েই থাকে সেদিকে। কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরের আঁধো আলো আঁধো অন্ধকারে মায়ের সে হাসি এমন মুগ্ধ করে তাকে! মাহমুদ ভাবে, 'অনন্তকাল যদি মায়ের মুগ্ধকর হাসির দিকে এমন চেয়ে থাকা যেত!'

দুই

লাল কায়দা সামনে করে বসে আছে মাহমুদ। পড়ছে না, তবু অন্যদের দেখাদেখি দুলছে সে। মক্তবের উস্তাদজি আসেননি এখনও। মাহমুদ অপেক্ষা করছে তার জন্য। তিনি এসে প্রথমেই আজ মাহমুদকে 'কায়দা ধরাবেন'।

নতুন পরিবেশ। তারই বয়সি ছেলেপুলে দুলে দুলে পড়ছে আর ফাঁকে ফাঁকে চেয়ে চেয়ে দেখছে তাকে। দুটি ছেলে পড়া বন্ধ করে গল্পও করে নিল কিছু সময়। মাহমুদের দিকে তাকিয়ে এমন করে হাসল, মাহমুদের মনে হলো যে, তাকে নিয়েই তারা হাসাহাসি করছে। কিন্তু মাহমুদ ভেবে পেল না, তাকে নিয়ে অমন করে হাসাহাসির কী আছে!

স্কুলে কেউ এমন করলে এতক্ষণে তাকে দেখে নিত মাহমুদ। এই তো, সেদিন রাব্বি তাকে নিয়ে মশকরা করছিল। আচ্ছা মতোন ধমকে দিয়েছিল তাকে। উচিত শিক্ষা হয়ে গেছে রাব্বির। আর কোনো দিন সাহস হবে না তার মাহমুদকে নিয়ে মশকরা করার। কিন্তু এখানে সে কিছুই করতে পারে না। আজই প্রথম সে এল মকতবে। চেনা নাই-জানা নাই, পরিচিত নাই কেউ। এ অবস্থায় কারোর সাথে ঝামেলায় যাওয়া ঠিক হবে না। তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে দুটি ছেলে, এটা বুঝতে পেরেও মাহমুদ গা করে না। এড়িয়ে যায় তাদের। এ ছাড়া আর কোনো উপায়ও যে তার নাই!

ছেলে দুটোর থেকে চোখ সরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে মাহমুদ। মকতবের জানালার বাইরে একটা কাঁঠাল গাছ দেখা যায়। তার ডালে একজোড়া টুনটুনি এসে বসেছে। কোত্থেকে কেমন ফুড়ুৎ করে উড়ে এল তারা। মাহমুদ লাল কায়দা সামনে করে টুনটুনি-জোড়ার দিকে চেয়ে থাকে অপলক।

তার চমক ভাঙে উস্তাদজির ডাকে। আশ্চর্য! কখন তিনি এসেছেন এবং বসেছেন তার টেবিলের সামনে মাহমুদ খেয়ালই করেনি। কী ভাবছিল এতক্ষণ সে অমন

আনমনা হয়ে! মাহমুদ লাল কায়দা হাতে করে উঠে গিয়ে উস্তাদজির টেবিলের সামনে বসে পড়েন।

: উঁহু...এভাবে কায়দা ধরতে হয় না, মাহমুদ। সুন্দর মতোন বুকের সাথে জড়িয়ে ধরতে হয়।

উস্তাদজি সতর্ক করেন মাহমুদকে।

উস্তাদজির ডাকে মাহমুদ লাল কায়দা হাতে নিয়ে তার কাছে যখন উঠে যাচ্ছিল, হাতের কায়দাটা তখন ডানে বামে দুলছিল। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল, মাহমুদের হাতে বুঝি একটা পেণ্ডুলাম। লাল টকটকে কাগজের একটা পেণ্ডুলাম। সেটা উস্তাদজির চোখ এড়ায় না। তার সজাগ চোখে ঠিকই ধরা পড়ে যায় সে দৃশ্য। তা থেকে সতর্ক করার জন্যই সুন্দর করে বুঝিয়ে কথাটা বলেন তিনি মাহমুদকে। তাকে আরও বলেন,

: শুধু আরবি বইই নয়। যে কোনো বই, যা আমাদেরকে বিদ্যা দেয়, যা থেকে আমরা জ্ঞান লাভ করি তার আদব বজায় রাখতে হয়। অবহেলার সাথে দুই আঙুলে ধরা, তারপর সেটা হাতে ধরে দুলিয়ে দুলিয়ে চলা কিংবা মুড়িয়ে গোল করা এগুলোর কোনোটাই উচিত নয়। অনেকে আরবি বই কিংবা বাংলা বইয়ের পৃষ্ঠা খুব জোরে জোরে ওলটায়। বইয়ের পাতা ভাঁজ করে রাখে। এরপর এমন অযত্নের সাথে পড়ে যে, বইয়ের বাঁধন ঢিলে হয়ে যায়। বাঁধাই খুলে যায়। মলাট ছিঁড়ে যায়। এর সবই খারাপ। যার থেকে তুমি বিদ্যা নিচ্ছো, আরবি শিখছো তাকে যত্নে রাখতে হবে না! তার যত্ন আত্মি না নিলে সে তোমায় জ্ঞান দেবে কেন!

উস্তাদজি থামেন তার কথা শেষ করে। সামনে বসে থাকা মাহমুদ কিছুটা লজ্জিত। এবং সে অনুতপ্তও। মাহমুদের এই এক ভালো গুণ। কেউ সুন্দর করে তার ভুলটা ধরিয়ে দিলে সে বুঝতে পারে। এবং ফিরে আসে তার ভুল থেকে। যেমন, এই এখন সে ভাবছে উস্তাদজি যা যা বললেন তার প্রায় সব তো সেও করে। তার ক্লাসের বইয়ের পাতা একটাও অক্ষত নাই। যে কটা আছে তাতেও এলমেলো কলমের দাগ। বইয়ের মলাট ছিঁড়ে যায় তো প্রথম সপ্তাহেই। আম্মুও অনেক বলেছেন এসব নিয়ে। কিন্তু কেন যেন তারপরও বইয়ের যত্ন নেয়া হয়ে ওঠে না মাহমুদের। উস্তাদজির কথাগুলো তার ভেতর অন্য রকমভাবে নাড়া দিয়েছে। বইয়ের যত্ন না নিলে সে

তো শিখতে পারবে না কিছু বই থেকে। মাহমুদ সতর্ক হয়। এবং প্রতিজ্ঞা করে যে, এখন থেকে সব বই সে আরও যত্নের সাথে পড়বে। আরবি হোক, বাংলা হোক, ইংরেজি-অঙ্ক যা-ই হোক না কেন তাকে রাখবে আদরের সাথে। বই আদব ও আদরের সাথে রাখলে, যত্ন নিয়ে পড়লে সে আরও অনেক বেশি শিখতে পারবে বই থেকে। উস্তাদজি তো তেমনই বললেন! আর উস্তাদজি নিশ্চয় মিথ্যা বলবেন না! তাদের কথা কি আর মিথ্যা হয়!

ভাবনার ঘোর থেকে আবারও বেরিয়ে আসে মাহমুদ। অজান্তেই কত্ত কিছু ভেবে নিয়েছে সে এই এতটুকুন সময়ের মধ্যে। সে যে এত সুন্দর করে ইদানীং ভাবতে পারছে এটা দেখে দারুণ অবাক হয়। মনে মনে বেশ আনন্দও হয় তার। হাসির রেখাও বুঝি জেগে ওঠে তার দুই ঠোঁটে। কিন্তু উস্তাদজির সামনে বসে তো আর হাসা যায় না। দ্রুতই সে তাই লুকিয়ে ফেলে তার ঠোঁটের কোণে জেগে ওঠা মুচকি হাসির সরল রেখা।

উস্তাদজি প্রথম দিনের সবক দিলেন মাহমুদকে। আলিফ, বা, তা, ছা, জীম। পাঁচটি অক্ষর আঙুল দিয়ে ধরে ধরে বারবার পড়ালেন। খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ছে মাহমুদ। তার আনন্দও হচ্ছে ভীষণ। যে কোনো নতুন জিনিস শিখতে পারার ভেতর আনন্দ আছে। কিন্তু আরবি শিখতে এসে মাহমুদের মনে হচ্ছে এ আনন্দ অন্য রকম। যতবার সে উস্তাদজির সাথে সুর মিলিয়ে উচ্চারণ করে উঠছে আলিফ, বা, তা, ছা, জীম তার বুক ভরে উঠছে অন্যরকম আনন্দ দোলায়। এমন আনন্দ সে আর কিছুতে পেয়েছে কি না কোনোদিন ভাবতে লাগল।

মকতব থেকে বাসায় ফিরেছে মাহমুদ। সোফায় বসে মনের আনন্দে পা দোলাচ্ছে সে। তার আজ ভীষণ আনন্দ। ভাইয়ার কথা মেনে নিয়ে আরও অনেক আগেই তার মকতবে যাওয়া উচিত ছিল। আরবি পড়তে যে এত মজা সে তা জানতই না। জানলে কি আর এত্ত দেরি করতো মকতবে যেতে! আরেক বিপদ ছিল তার ঘুম। মকতব বসে সকালে। ফজরের পরপর। সে তো এতক্ষণ ঘুম থেকেই উঠতে পারতো না। মাহমুদের এখন খুব করে বুঝে আসছে যে, সকালে ঘুমিয়ে থাকা কী পরিমাণ মন্দ কাজ। দিনের এমন মিষ্টি একটা মুহূর্ত ঘুমিয়ে থাকে তো বোকারাই। কী সুন্দর ভোর! নির্মল। স্বচ্ছ। অথচ সে কিনা এতকাল ওই বোকাদের মতো ঘুমিয়েই নষ্ট করত সকালটা। আর থাকতে চায় না সে বোকাদের দলে।

আম্মু এসে বসলেন মাহমুদের পাশে। তার হাতে একটা পিরিচে ডিম সেদ্ধ। এই আরেকটা যন্ত্রণার ব্যাপার মনে হয় মাহমুদের কাছে। রোজ সকালে স্কুলে যাবার সময় ডিম সেদ্ধ খেতে হয়। এটা খেতে যে কী পরিমাণ কষ্ট হয় তার! গলা থেকে নামতেই চায় না। কিন্তু আম্মু-আব্বু-ভাইয়া কেউই তার সেই কষ্টটা বুঝতে পারে না। সবাই জোর করে খাইয়েই ছাড়ে তাকে এই বিরক্তিকর সেদ্ধ ডিম। মাহমুদের মন আজ এতই ভালো যে, ডিম সেদ্ধকেও বিরক্তিকর লাগছে না। আম্মুর হাত থেকে নিয়েই গপ করে মুখে পুরে নেয়। আম্মু কেমন অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন মাহমুদের দিকে। বিস্ময় নিয়ে বলেন,

: বাব্বাহ! আজ দেখছি একদমই অন্য রকম তুমি! সকালে না ডাকতেই ঘুম থেকে জেগে গেলে। নিজের থেকেই মাসজিদে গিয়ে সালাত পড়লে ফজরের। আবার মকতবেও চলে গেলে একা একা। ঘটনা কী মাহমুদ! এত পরিবর্তন হঠাৎ করে! বেশ আনন্দিতও দেখাচ্ছে তোমাকে।

মাহমুদ রহস্যময় ভঙ্গিতে তাকায় আম্মুর দিকে। চোখ নাচিয়ে মুচকি হাসিতে আম্মুর প্রশ্নের উত্তর দেয়। কিছু সময় মুখে কিছু বলে না। অঙ্গভঙ্গিতে কেমন রহস্য। তারও খানিক পর সে বলে,

: যাই, সাজিদকে জানিয়ে আসি। সে কুরআন মাজিদ পড়তে পারে বলে কত্ত ভাব নেয়! আমি আরবি শেখা শুরু করেছি। অল্প ক'দিনের মধ্যেই শিখে ফেলব কুরআন মাজিদ পড়া। তখন দেখব, সে কী নিয়ে বড়াই করে!

ছেলের কাণ্ড দেখে হাসেন আম্মু। বলেন,

: তুমি কি সাজিদের ওপর বড়াই করবার জন্যই কুরআন পড়া শিখছ?

মাহমুদ মাথা নাড়ে। বলে,

: হুম। সেইজন্যই তো শিখছি। জানো আম্মু, ও কুরআন পড়তে পারে আমি পারি না দেখে সেদিন সবার সামনে আমাকে নিয়ে মজা করেছে। সেজন্যই তো জলদি জলদি মকতবে যাওয়া ধরেছি। কুরআন শেখা শুরু করেছি।

আম্মু হাসেন মুচকি করে। বলেন,

: খুবই ভালো কথা, মাহমুদ। তুমি সাজিদকে জবাব দেয়ার জন্য কুরআন পড়া শুরু

করেছ। এটা তো খুব বেশি খারাপ না। ভালোই। কিন্তু আরও বেশি ভালো কী, জানো! তুমি আল্লাহ তাআলাকে খুশি করবে শুধু সে উদ্দেশ্যেই যদি কুরআন পড়। তোমার সাত সকালে মকতবে যাওয়া, উস্তাদজির কাছে কুরআন শেখা এর সব যদি হয় কেবল আল্লাহ তাআলারই জন্য সেটাই সব চাইতে ভালো হবে, মাহমুদ! সাজিদের ওপর বড়াই করে কী হবে, বলো! কারোর ওপর বড়াই করা ভালো কাজ নয়। ইবাদাত-বন্দেগি নিয়ে বড়াই তো আরও বেশি মন্দ কাজ। সাজিদ করেছে করুক। তাকে তুমি বরং বিষয়টা বুঝিয়ে দেবে। কুরআন শেখার উদ্দেশ্য একটাই হতে হয়। শুধু কুরআন শেখাই নয়। বরং যত ভালো কাজ আছে পৃথিবীতে, তার সব করতে হয় একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে খুশি করবার উদ্দেশ্য নিয়েই। মানুষকে দেখানোর জন্য, কিংবা কারোর ওপর বড়াই করবার জন্য নয়। তুমি মনে মনে ভাবো এবং মনের ভেতর এই চিন্তা গেঁথে নাও যে, কুরআন মাজিদ পড়া শিখছো একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে খুশি করবার জন্যই। কাউকে দেখানোর জন্য কিংবা কারোর ওপর বড়াই করবার জন্য নয়।

মাহমুদ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে আম্মুর দিকে। আম্মু এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে তা যেন মাহমুদের জানাই ছিল না। আম্মুর এমন কথা শুনে তার মনের ইচ্ছা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। মাহমুদ ভাবে, তাই তো! আম্মু তো ঠিক কথাই বলছেন। সাজিদের সাথে বড়াই করে কী হবে! তার চাইতে আমি নিয়ত করি যে, কেবল আল্লাহ তাআলাকে খুশি করবার জন্যই আমি কুরবান শিখছি। তাহলে আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় আমাকে ভালোবাসবেন। আর আল্লাহ আমাকে ভালোবাসলে আমার আর কী লাগে!

আম্মুর কথাগুলো খুব ভালো লাগে মাহমুদের। তার খুব ইচ্ছে করে আম্মুর দুই গালে দুইটা চুমু এঁকে দিতে। কিন্তু কেন যেন মাহমুদের লজ্জা মতোন লাগে। সে কি তবে বড় হয়ে গেছে! শুনেছে বড় হয়ে গেলে মায়ের গালে চুমু দিতে সামান্য লজ্জা লজ্জা লাগে। সে বড় হয়ে গেছে, এটা ভেবে আনন্দ হয়। আবার আম্মুর গালে চুমু এঁকে দিতে পারছে না দেখে দুঃখও জাগে কিছুটা। সে কি লজ্জা ভুলে দু চোখ বুজে মিষ্টি করে চুমু এঁকে দেবে আম্মুর দুই গালে! ভাবনায় পড়ে যায় মাহমুদ।

তিন

আব্বুর হাত ধরে প্লাটফর্মের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে মাহমুদ।

এত সময় প্লাট ফরম ভর্তি ছিল মানুষে। চিৎকার-চেঁচামেচি, লোকজনের হৈ হুল্লোড়ে মাথা ধরে আসছিল ওর। মাহমুদ ভেবে পায় না যে, মানুষ স্টেশনে, বাজারে এমন চিৎকার কেন করে! কেউই যেন এসব জায়গায় এসে আস্তে কথা বলতে পারে না।

ঢাকাগামী সীমান্ত এক্সপ্রেস মাত্র ছেঁড়ে গেছে। তাতেই পাতলা হয়ে এসেছে প্লাটফর্ম। এখন একটু ভালো লাগছে। শীতের দুপুর। মিষ্টি রোদের আভা গায়ে এসে লাগছে তাদের। এ রোদে তেজ থাকে না। শীতের আমেজ কমিয়ে দিয়ে শরীর জুড়ে একটা ভালোলাগা ছড়িয়ে দিয়ে যায়। মাহমুদের ইচ্ছে করে, এমন সোনারোদ গায়ে মেখে সমস্ত দিন সে দাঁড়িয়ে থাকবে প্লাটফর্মের এই প্রান্তে।

আব্বু আচমকা টান দেন মাহমুদের হাত ধরে। রোদমাখা ঘোর তাতে কেটে যায়। আব্বু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। ছাউনির নিচে পেতে রাখা বেঞ্চিতে গিয়ে বসতে চান। যাত্রীর ভিড় কমে যেতেই ছাউনির বেঞ্চিগুলো খালি হয়ে পড়েছে। পা ধরে আসছে মাহমুদেরও। সেই কখন থেকে দাড়িয়ে আছে তারা দুজন। বিরামহীন এমন কত সময় আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়! যদিও রোদের আভা পুলকিত করছিল তবু পায়ের পাতায় ব্যাথাবোধ হতেই মাহমুদও রাজি হয় আব্বুর সাথে ছাউনির নিচে গিয়ে বসতে।

ঢাকার ট্রেন আজ লেট। আরও আধা ঘন্টা পূর্বে এসে প্লাটফর্মে ঢোকার কথা। মাহমুদ অধীর আগ্রহ নিয়ে বারবার উঁকি দিচ্ছে রেল লাইনের প্রান্তে। কিন্তু রেলের দেখা মেলে না।

পরীক্ষার ছুটি পেয়ে ভাইয়া আজ বাড়িতে ফিরছেন। মাহমুদেরও খুব ইচ্ছে করে, ভাইয়ার সাথে ঢাকার মাদরাসাতে পড়বে। রেলে চড়ে ঢাকায় যাবে। আবার প্রতিবার

ছুটিতে এমন করে ফিরবে বাড়িতে। তাকে এগিয়ে নিতে আব্বু এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন স্টেশনে। আম্মু হরেক রকম পিঠাপুলি বানিয়ে অপেক্ষা করবেন। বারবার দরোজার কাছে এসে দেখতে চাইবেন বাড়ি পৌঁছুলাম কি না! এমন সব ইচ্ছা খুব করে পেয়ে বসে মাহমুদকে। ভাইয়াকে জানিয়েছেও সে তার ইচ্ছের কথা। ভাইয়া বলেছেন, এখন সে ছোট। বড় হলে তাকেও ঢাকা শহরে পড়ার জন্য পাঠানো হবে। ভাইয়াও নাকি তার মতোন ছোট ছিল যখন, তখন বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করেছেন। মাহমুদ ঠিক করেছে আসছে বছরই সে ভাইয়ার সাথে ঢাকায় যাবার জন্য বায়না ধরবে। সবাইকে বোঝাবে যে, সে আর ছোট্টটি নেই। অনেক বড় হয়ে গেছে। কিন্তু সে নিশ্চিত নয় যে, বাড়ির কেউ তার আবদার গ্রাহ্য করবে কি না!

হুইসেলের তীব্র আওয়াজে ছেদ পড়ে মাহমুদের ভাবনায়। ট্রেন এসে পৌঁছেছে স্টেশনে। আব্বুর হাত ধরে উঠে দাঁড়ায় মাহমুদ। এগিয়ে যায় ট্রেনের বগির কাছে। কিছুদূর হাঁটতেই দেখে ভাইয়া পা রাখছেন প্লাটফর্মের ওপর। কাঁধে তার ঝোলানো একটি ব্যাগ। হাতে ধরা আরও একটি। আব্বু সামনে এগিয়ে গিয়ে ধরলেন হাতের ব্যাগটি। ভাইয়া এত সুন্দর করে সালাম দিলেন আব্বুকে! মাহমুদ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল তার সালামের উচ্চারণে। প্রতিটি শব্দ কত সুন্দর আলাদা আলাদা। মাহমুদ সালাম দিতে গেলেই কেমন জড়িয়ে আসে। ভালো করে সালাম দেয়াটা রপ্ত করতে হবে ভাইয়ার থেকে। মাহমুদের ইচ্ছে, এবারের ছুটিতে আরও অনেক কিছু শিখবে সে। আব্বু জড়িয়ে ধরলেন ভাইয়াকে। এই দৃশ্যটা মাহমুদের কাছে খুবই ভালো লাগে। প্রতিবার ভাইয়াকে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে আসে যখন এবং যখন নিতে আসে এভাবে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরে একজন অন্যজনকে। আশ্চর্য! ভাইয়া মাহমুদকেও এবার জড়িয়ে ধরলেন। খুশিতে আরেকটু হলেই চোখে পানি চলে আসত তার। ভাইয়া এত ভালো কেন!

মাহমুদ খেয়াল করে ভাইয়া দেখতেও অনেকটা বদলে গেছেন। গতবার যখন এসেছিলেন মুখের দাড়ি ছিল ছোট আর পাতলা। বাতাসে ফুরফুর করে উড়ত সেগুলো। এবারে তার দাড়ি বেশ ঘন। এবং বড়ও হয়েছে অনেক। ঘন কালো দাড়িতে ভাইয়াকে আরও অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। ভাইয়ার চেহারার ঔজ্জ্বল্য বেড়ে গেছে যেন আরও কয়েকগুণ। মাহমুদ মনে মনে ভাবে, সেও ভাইয়ার মতোন এমন করে দাড়ি রাখবে। কাটবে না কোনোদিন। ছোটও করবে না। ভাইয়ার মতোন সারাক্ষণ এমন পরিপাটি করে রাখবে।

আব্বুর সাথে কথা শেষে ভাইয়া ফিরলেন মাহমুদের দিকে। বলেন,

: কী রে, কেমন আছ তুমি? লেখাপড়া চলছে ঠিকঠাক?

মুখে হাসি এনে বলে,

: ভালোই আছি।

লেখাপড়া বিষয়ে মাহমুদ আর কিছু বলে না। কৌশলে এড়িয়ে যায়। ভাইয়ার এই এক সমস্যা। ঘন ঘন লেখাপড়ার খবর জানতে চান। এটা জানা কি খুব দরকার? মনে মনে ভাবে মাহমুদ।

এরই মধ্যে আব্বু বলে ওঠেন,

: এসব আলাপ সব বাড়ি গিয়ে হবে। লেখাপড়া একদমই কমিয়ে দিয়েছে মাহমুদ। তুমি যে কয়দিন আছ একটু ভালো মতোন বুঝিয়ে দিয়ে যেও। ভালো করে না পড়লে ও বড় মানুষ হবে কী করে! আগে বাড়িতে চলো। তোমাদের আম্মু বারবার ফোন দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যেন অধীর হয়ে বসে আছেন তোমার অপেক্ষায়।

মাহমুদ মনে মনে ফুঁসে ওঠে একটু। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না। ভাইয়া আর আব্বুর সামনে কিছু বলবে এতটা দুঃসাহস তার নেইও। সেই রকম শিক্ষাও সে পায়নি। সে বরং ভাবতে থাকে মনে মনে। উপায় বের করতে থাকে। ভাইয়া যে কয়দিন বাড়িতে আছেন ক্লাসের পড়া থেকে পালানো যায় কীভাবে! সে শিখবে। ভাইয়ার থেকে তার অনেক কিছু শেখার ইচ্ছা। কিন্তু কেন যেন ক্লাসের পড়াতে তার মন বসে না। কিছুতেই বসে না। আনন্দের ব্যাপার হলো, ভাইয়াও ক্লাসের পড়া নিয়ে খুব বেশি চাপাচাপি করেন না। তার কথা হলো, পড়া একবার কমপ্লিট করে ফেললে সারাদিন ক্লাসের বই সামনে নিয়ে বসে থাকার কোনো অর্থ হয় না। তবে শিখতে হবে অনেক। পড়তে হবে অনেক কিছু। ক্লাসের বইয়ের বাইরেও বহু বিষয় জানার আছে। ক্লাসের বইয়ের বাইরেও অনেক বই লিখেছেন লেখকেরা। সেসব পড়তে হবে। জানতে হবে অনেক কিছু। সেগুলো পড়তে আপত্তি নেই মাহমুদের। সে তো বরং সেই 'অনেক কিছু' জানতেই আগ্রহী বেশি।

ভাইয়ার হাত ধরে হাঁটতে থাকে মাহমুদ। প্লাটফর্ম পেরিয়ে স্টেশনের প্রায় শেষ প্রান্তে চলে আসে তারা তিনজন। এখান থেকেই বের হয়ে রিক্সা করে যেতে হবে